শৈলেশ্বর ঘোষ

রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড: কবিতা

সম্পাদনা

সব্যসাচী সেন

লিইবার ফিয়েরা

সূ চি প ত্র

কবি শৈলেশ্বর ঘোষ ও হাংরি সাহিত্য আন্দোলন	৭-২৯
প্রকাশকের নিবেদন	৩১
জন্মনিয়ন্ত্রণ	৩৩-৭৮
অপরাধীদের প্রতি	৭৯-১৫৪
দরজাখোলা নদী	১৫৫-২৩০
পূর্ণগ্রাস	২৩১-৩০৭
শৈলেশ্বর ঘোষের চারটি কাব্যগ্রন্থের তথ্যসূত্র	৩০৯-৩১২
শৈলেশ্বর ঘোষের জীবন-পঞ্জি	৩১৩-৩১৬
কবিতার সম্পূর্ণ সূচিপত্র	৩১৭-৩২০

কবি শৈলেশ্বর ঘোষ ও হাংরি সাহিত্য আন্দোলন

'ষাট দশক থেকে শুরু হওয়া অসংখ্যবার ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়ানো বাংলা কবিতার সবচেয়ে প্রতিবাদী, অন্তর্ঘাতমুখর, আন্ডারগ্রাউন্ড 'হাংরি আন্দোলনে'র প্রাণপুরুষ তিনি। কবিতায় আত্মধ্বংস ও আত্মনির্মাণের ভিতর দিয়ে নিজের পদচিহ্ন এঁকে গেছেন তিনি। বানানো 'অস্তি' প্রতিপক্ষ হিসোবে প্রবল 'নাস্তি' সংক্রমণকেই তিনি বরণ করেছেন প্রতিস্পর্ধী সত্তায়। তাঁর কবিতা যেকোনো ধরনের এস্টাবলিসমেন্টের সদর দপ্তরে সাহস দেখায় পার্সেল বোমা রেখে আসার। 'বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থান' ভেঙে এই অঘোর পন্থার সাধক কবি সাপের ছোবলের ভিতর খুঁজে পান মৃত্যু নয়, মারণ রামধনু। কলমকে বানিয়ে তোলেন দিশি পাইপ-গানের মতোই খতরনাক, শেষ রাতের ঝোড়ো হাওয়ায় টের পান অমোঘ সাইরেন। স্বতঃস্ফূর্ত অরগ্যানিক নৈরাজ্য রয়েছে শৈলেশ্বরের কবিতায়।'— অর্ণব সাহা[১]

হাংরি জেনারেশনের সূচনা ও স্রষ্টা

ষাটের দশকে হাংরি আন্দোলনের জন্ম। এর জন্মদাতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। টাইম ম্যাগাজিনে আমরা হাংরি জেনারেশনের জন্ম হিসেবে যে সালটা পাচ্ছি সেটা ১৯৬২। কিন্তু 'হাংরি কিংবদন্তী'তে মলয় রায়চৌধুরী দাবি করেছেন এ আন্দোলন তিনি নাকি শুরু করেছিলেন পাটনায় ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে একটি ইংরাজি ম্যানিফেস্টো লিখে! তাই তিনি নাকি এ আন্দোলনের স্রষ্টা! তিনি জানিয়েছেন প্রথম ইংরাজি ম্যানিফেস্টোতে ছিল আন্দোলনের বিষয়-সংক্রান্ত কিছু কথা। পরেরটায় ইংরাজি ম্যানিফেস্টোতে নিজেকে স্রষ্টা, দেবী রায়কে সম্পাদক, আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে লিডার বানিয়ে দেন। কিন্তু হাংরি কিংবদন্তী-তে তার দেওয়া তথ্যগুলির সত্যতা অনেকেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই গ্রন্থেই স্বীকার করা হয়েছে— শঙ্খ ঘোষ ও শামসুর রহমান 'হাংরি কিংবদন্তী'তে দেওয়া তথ্যগুলি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সলটেড ফেদার-এ যে ম্যানিফ্যাস্টোটি সংযোজিত হয়েছে সেটিতেও কোনো স্রষ্টা, সম্পাদক বা নেতা এসব ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই। এটাই ছিল প্রথম ম্যানিফেস্টো। এই সলটেড ফেদার সম্পর্কে পাঠককুলকে একটি তথ্য জানাই— গোপনে অধিকাংশ হাংরিদের না-জানিয়ে বিদেশ থেকে এই সংকলনটি

করার পিছনে মলয় রায়চৌধুরীর ভূমিকা ছিল। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত প্রথম ম্যানিফেস্টোটি, যেটিকে তিনি প্রথম বলেছেন, যেটি এখন প্রথম বলে দাবি করছেন সেটি 'সলটেড ফেদার'-এ সংযোজন করলেন না কেন? ১৯৯৪ সালের জুন মাসের আগে, মলয় রায়চৌধুরী রচিত 'হাংরি কিংবদন্তী' প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অনেকেই জানতেন— এ আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পত্রিকায় বিনয় মজুমদারের একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে লিখলেন প্রথম হাংরি জেনারেশন সম্পর্কে কিছু কথা। সেখানে 'হাংরি জেনারেশন' নামক ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ ছিল। সেখানেই প্রথম লেখা হয়েছিল হাংরি জেনারেশন নিয়ে কিছু কথাবার্তা। সেটা ছিল ১৯৬২ সাল। আর 'টাইম ম্যাগাজিন'-এ যে সালটা আমরা পাচ্ছি সেটাও ১৯৬২ সাল। তাহলে রায়চৌধুরী বাদার্স যদি ১৯৬১ সাল উল্লেখ করেন তাহলে শক্তির ১৯৬২ সালে সম্প্রতি কাগজে 'হাংরি জেনারেশন' নামক প্রথম লেখাটি নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়ে যায়। আমার কাছে প্রথম ম্যানিফেস্টোটি আছে (যেটিকে রায়চৌধুরী বাদার্স প্রথম ম্যানিফেস্টো বলে দাবি করে আসছেন।) সেটিতে কোনো সন তারিখের উল্লেখ নেই। যেকোনো গবেষক বুঝবেন যেকোনো পত্রিকা প্রকাশ করলে সেগুলিতে সন-তারিখের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সন-তারিখ নেই বলেই আমরা সেটিকে প্রথম ম্যানিফেস্টো বলে মেনে নিতে পারছি না। সে সময় শক্তির হাংরি জেনারেশনে যোগ দিয়েছিলেন উৎপলকুমার বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, দেবী রায়, মলয় রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আসলে কৃত্তিবাস-এর মধ্যে সেসময় একটা ফাটল দেখা দিয়েছিল। যার একদিকে ছিলেন সুনীল গাঙ্গুলী, অন্যদিকে ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ফলত শক্তির উদ্যোগেই হাংরি জেনারেশন-এর জন্ম। শক্তির বন্ধু সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 'এষণা' পত্রিকায় লিখেছেন—

> 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত হাংরি জেনারেশনের কোনো মুখপত্র নেই— বস্তুত হাংরি জেনারেশন একটা আইডিয়া— যার বিষয়ে শক্তি একটি গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথম কিছু লেখে। প্রয়োজনবোধে সেই লেখা থেকে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃত দিচ্ছি: 'বিদেশে সাহিত্য কেন্দ্রে যে-সব বর্তমান হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি অ্যাংরী বা সোবিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশেও কোনো অনুক্ত বা অপরিস্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে 'ক্ষুধা সংক্রান্ত' আন্দোলনই

হওয়া সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক অবস্থা এ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরী হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যেকোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনো রূপ বা কোনো রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বীট বা অ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'। অর্থাৎ ভাত-ডাল-চিংড়ি মাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বীট জেনারেশন সমেত মেখে লঙ্কা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম-সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হলো শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হলো গদ্য, পদ্য, ছবি ইত্যাদি। গু-গোবরের সামিল।... এই ক্ষুধার্তদের কেউ কেউ লিঙ্গ প্রহার করে দেখবেন হৃদয়ের যতদূর অধিষ্ঠান লিঙ্গ ততদূর যায় কিনা কিংবা এক কথায় উক্ত অঙ্গ হৃদয়কেই স্পর্শ করে কিনা..." (সম্প্রতি: ৩য় সংকলন, বাংলা ১৩৬৯ সন)

"শক্তি খুবই অন্যমনস্ক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কথাগুলি লেখেন, আমরা বন্ধুরা কেউই জানতাম না শক্তি এ-রকম ভাবছে, কিন্তু ঐ নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সুতৃপ্তি রেস্তরায়, পত্র-পত্রিকায় ও কফি হাউসে। হাংরি জেনারেশন নামক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পাটনা থেকে মলয় রায়চৌধুরী নামক এক অজ্ঞাত যুবক এর কিছুদিন নেতৃত্ব করেন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন এমন এক জিনিস যে কারো হাতেই নেতৃত্ব বেশিদিন থাকে না।"[২]

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে মলয় রায়চৌধুরী কিছুদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন মাত্র, স্রষ্টা নন— স্রষ্টা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যদিও সেটা ছিল ইস্তেহারভিত্তিক মজা-করা। সেটাকে আন্দোলন না-বলে বলা ভালো শুধুই হাংরি জেনারেশন। সেদিন কেমন ছিল হাংরি জেনারেশন? কবি উৎপলকুমার বসু লিখেছিলেন, **'হাংরি সেভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি যেখান থেকে পারে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বুলেটিন বের করে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয় সমীর শক্তি লিখেছিল। এগুলির নীচে অনেকের নাম বসিয়ে দেওয়া হত। বহু ক্ষেত্রেই যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে তাদের**

জিজ্ঞাসা করাও হত না।... হাংরিদের সেভাবে কোনো কাগজও ছিল না। হয়তো ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বের হল, নাম দিয়ে দিল হাংরি বুলেটিন নং ১২। হয়তো ১০ বা ১১ বেরোয়ইনি।' (যোগসূত্র-১৯৯৪)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—'ইস্তেহার ছাড়া এগুলো আর কিছু ছিল না।' সেগুলির কোনো সাহিত্যমূল্য ছিল না। 'ইস্তেহার ভিত্তিক বা মজা করা হাংরি জেনারেশন' যে বেশিদিন টেকেনি সেটা যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় সেটা মলয় রায়চৌধুরীও নিজেও স্বীকার করেছেন—' **হাংরি আন্দোলনের সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। এই ছোট্ট সময়ে শতাধিক ছাপানো আর সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছিল, অধিকাংশই হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, কয়েকটা দেয়াল-পোস্টারে, তিনটি এক ফর্মার মাপে, এবং একটি (যাতে উৎপলকুমার বসুর 'পোপের সমাধি' শিরোনামের বিখ্যাত কবিতাটি ছিল) কুষ্ঠি-ঠিকুজির মতন দীর্ঘ কাগজে।**' (৩) ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন ত্যাগ করলেও হাংরি আন্দোলন থেমে থাকেনি। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য ও শৈলেশ্বর ঘোষ এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

স্রষ্টাবিতর্ক

১৯৬৪ সালে 'আদালতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার বয়ানে বলেছেন, 'It is a fact that this literay movement (Hungry Generation) was strated by me with some other friends.' **(এটা সত্যি যে আন্দোলন আমি ও কয়েকজন বন্ধু মিলে আরম্ভ করেছিলুম')**[৪] ১৯৬৫ সালে মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মলয়বাবু দীর্ঘদিন লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ১৯৮৪ সালে 'ক্ষুধার্ত' সপ্তম সংখ্যায় শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতার ওপর একটি আলোচনা করে মলয় রায়চৌধুরী লেখালিখিতে ফিরে আসেন । 'দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর মলয়ের পুনরাগমন এই সংকলনে।' এদেশের কোনো পত্রিকায় নয়, তিনি নিজেকে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা প্রতিপন্ন করে বাংলাদেশের ঢাকায় মিজানূর রহমান সম্পাদিত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'হাংরি কিংবদন্তী' লিখতে থাকেন। মলয়বাবুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু সুবিমল বসাক 'হাংরি কিংবদন্তী'র সংযোজনে লিখেছেন— 'হাংরি কিংবদন্তী' প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলাদেশে, ঢাকা থেকে মীজানূর রহমানের পত্রিকায় ধারাবাহিক ছ'কিস্তিতে। প্রথম ২/৩ কিস্তি বার হবার পর, এখনও এই ৩০ বছরের ব্যবধানে, আপত্তি জানান অনেকে। শামসুর

প্রকাশকের নিবেদন

কবির হাতে জন্ম নেওয়া শব্দ একেকটা যুদ্ধাস্ত্রের থেকেও শক্তিশালী। সেই শক্তিশেলের ক্ষমতা বুঝতে এগারো বছর লেগে গেল। কবি শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ এক বইমেলায় ঘটেছিল সম্ভবত ২০০৯ সালে। বন্ধুবর সব্যসাচীর সৌজন্যে ঘটেছিল সেই আলাপপর্ব। তারপর ওঁর লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। পাকাপাকিভাবে প্রকাশনার জগতে আসার সময়ে সব্যসাচীর সহযোগিতায় ওঁর রচনা সমগ্রের কথা পাকা হয়ে যায় ২০১০ নাগাদ। এর পরের বছর এইরকম বসন্তের সময়েই কবির সঙ্গে ওঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ ঘটে রচনা সমগ্রের কাজ নিয়ে। যদিও কিছু নথিগত গোলমালে বিষয়টি পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগে রচনা সমগ্র করার জটিলতা কেটে যায়। কথা হয় পেসমেকার লাগানোর পর বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। কিন্তু সে আর সম্ভব হয়নি। এরপর দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি। এল এফ বুকসের এডিটর ইন চার্জ হওয়ার পর দিন থেকেই সেই প্রস্তুতি শুরু হয় ২০১৮-তে এসে। এর পরের বছর কাজটির অনেকটাই এগিয়ে যায়। কিন্তু এরপর বাধা হয়ে দাঁড়ায় কোভিড পরিস্থিতি। আবার অপেক্ষা। অবশেষে বইটির পেপারব্যাক সংস্করণ বের হচ্ছে ২০২২-এর কলকাতা বইমেলায়। আর হার্ডবাউন্ড সংস্করণ পাওয়া যাবে ১লা বৈশাখ থেকে। চার খণ্ডের এই শৈলেশ্বর ঘোষ রচনা সমগ্রের প্রচ্ছদ করে দেওয়ার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ শিল্পী সনাতন দিন্দার কাছে। কৃতজ্ঞ বন্ধুবর সব্যসাচী সেন এবং কবি শৈলেশ্বর ঘোষের নাতি স্বপ্নদীপ হাজরার কাছে। এছাড়াও অনেকেই আছেন সেই কৃতজ্ঞতার তালিকায়। আশা করি এই রচনা সমগ্রের জন্য কবি শৈলেশ্বরের বহু পাঠক অনেকদিন ধরে মুখিয়ে আছেন। আর সমগ্র রচনা সমগ্র গড়ার পিছনে সম্পাদনায় যিনি নিয়োজিতপ্রাণ দিনরাত কাজ করেছেন এই কাজটির সার্বিকভাবে সাফল্যের জন্য সেই সব্যসাচীর উৎসাহ আর উদ্যমকে জানাই আন্তরিক ভালবাসা।

টিম এল এফ বুকসের পক্ষে
অরুণাভ বিশ্বাস

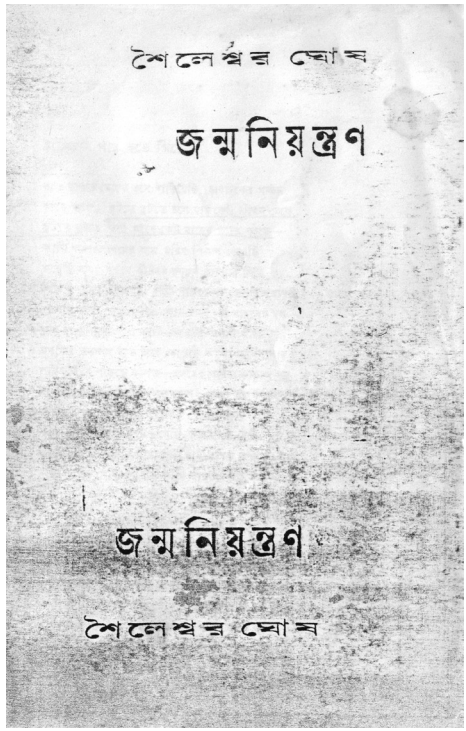

জন্মনিয়ন্ত্রণ

(১৯৬৩)

টার্মিনাস পার হতে গিয়ে

সাত রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, চারদিকের গর্জন
কানে আসছে, ছুটতে ছুটতে চলে যায় কেউ জীবন থেকে
ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে কেউ মায়ের গর্ভের কাছে—
আমি বঙ্গোপসাগরের বনে হরিণ শিকার দেখেছি
জন্মেছি মানব সন্তান কীটদষ্ট ফুসফুস সারাতে গিয়ে
শিখেছি বনের প্রয়োজন, দশটি পাপের ফল, দশটি পুণ্যফল
পেয়েছি আমি,— বলে দাও কোন পথে যায় মানুষের দল
বলে দাও— মৃত্যু বলে আমি পেয়েছি অঙ্গাঙ্গী বীর্য
প্রণতির জন্য তন্তুজাল দাঁত দিয়ে কেটেছি আমি, ভালোবাসার
পরিবর্তে সে পড়েছে কাপড়— সঙ্গমের পরিবর্তে আজ ঘুম
মনে হয় শ্রেয়— কুকুরের সেবাপরায়ণ আত্মা আমি চাই—
মানুষের কবরের উপর তৈরি হয় গোচারণভূমি
সবুজ আলেয়া দেখে ছুটে এসেছি লাল নক্ষত্র দেখে
থমকে গেলাম— এখন মাথাপিছু থান কাপড় বণ্টনের সময়
মানুষের মতো লোভ পেয়েছি আমি মানুষের মতো রক্ত

সমুদ্র উঠে আসে যুদ্ধভূমির দিকে, যুদ্ধভূমির মধ্যে
ছিটকে পড়েছি আমি— জীবনানন্দ দড়ি হাতে গিয়েছিল—
সোনার বাজারে এখন যুদ্ধ ব্যবসা বাজারে যুদ্ধ
মানুষের জগতে যুদ্ধ জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আমার মগজে যুদ্ধ চলছে
আমি জানি নিজের পায়ে হেঁটে নিজের ক্রুশে চড়ায় মানে জীবন
স্ত্রীলোকের পাশে শুয়ে ব্যর্থতার কথা ভাবা মানে জীবন
আমার জীবন আমার মৃত্যু আমার
আমার হাতপা আমার আমার মলমূত্র আমার
কবিতার নাম ভালোবাসা এবং মলমূত্রের নাম কবিতা—
ক্ষুধার তাড়নাবলে এসেছি ছুটে— আলুর আড়ৎদার

স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় গেছে পুরীর সৈকতে
আমাকে বল উদ্ধারযোগ্য নেশা কাকে বলে, বল—

প্রেমিকার অকাল মৃত্যুতে শোক হয়নি আমার
শীতের পার্কে বসে তার দীর্ঘ চুলের ভাঁজ ভালো লাগবে না আর
ভালো লাগবে না কারখানার উৎপাদন ছেড়ে গিয়ে পল্লীর বাতাস—
পশমবস্ত্র ছাড়া শীতঋতু বেশ্যাদেরও কেটে যায় গরম ভাবে
সেরকম হয়তো আমার আত্মার মাংস সয়ে যাবে সব—
বিদেশী যন্ত্রপাতি সরবরাহ বেড়ে যাবে কিন্তু মানুষকে
পোষমানাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল মানুষ—
ঠাণ্ডামাথায় আজ আমি খুন করতে চাই— আমি স্বাধীনতা চাই—

সভ্যতার জালিবোট আজ ফাঁকা— লোহার ব্যবহার গেছে বেড়ে
আফিঙখোর মাতাল নিজের নাম গেছে ভুলে, এখানে
মৃত্যুদের বাসভূমি দেখে যাব—
আমি মুর্খ বলে বুঝেছিলাম গৃহ্যদ্বার
যোনির দ্বিতীয় নাম জেনেছি জীবন
কবিতার প্রথম নাম ধর্ম দ্বিতীয় নাম আত্মা
আমি রান্না ঘর বলে জেনেছি প্রসাবঘর
শুধু পায়খানা করার পর হৃৎপিণ্ডের স্বস্তি ফিরে আসে
ওফ আমি স্বস্তি চাই আমি শান্তি চাই
চারিদিকের চিৎকার থেকে দূরে থাকতে চাই
তামা ও ইস্পাতের ব্যবহার থেকে আমাকে ফিরে নিয়ে চল—
নবান্নের অভিপ্রায়বশে যারা গিয়েছিল মাঠে জেনেছে
তারা সব? — এমনকি আজ অধঃস্তন পুংমানুষও ফিরে এল না ঘরে—
আমার ঘর আজ ফাঁকা— এঘরে দুজন স্ত্রীলোক নিয়ে আমি শুয়েছিলাম
এঘরে আমার পুরুষপ্রেমিকার সঙ্গে শুয়েছি আমি
আজ মগজ ফাঁকা— অস্ত্রের উপর স্নায়ুমণ্ডলের চাপ বড়ো বেশি—
আমি আজ বিভ্রান্ত— আমি আজ বিহ্বল
আমি বসন্ত ঋতুতে স্ত্রীসহবাস করে ফেলেছি
আমি ব্যবসাহীন বলে মাতাল হয়েছি
আমি ধর্ষণের অপরাধে জীবন পেয়েছি

শরতের চাঁদ দেখে আমার মুখ নিচের দিকে চলে গেছে
আমার অন্য উপায় নেই— স্ত্রীলোক রয়েছে শুয়ে
তার জরায়ুর আঁশ এখনও রয়েছে গায়ে—
হায়! সেই জরায়ু দেখেই মরতে হবে আমাকে—
তবু মানুষের কাছে ফিরে আসে আগামীকাল
মানুষের ভবিষ্যৎ নাই
উলঙ্গ হয়ে বরং স্ত্রীলোকের পুরুষের কাছে বৈদ্যুতিক সঙ্গম
চাওয়া ভালো— পিতার মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সন্তানে বর্তায় কিনা
এরকম আইনসঙ্গত ভাবনাও ভালো—
নিজের সন্তানের কথা ভাবা ভালো— কুমারীর গর্ভপাত করাও ভালো
বৈশ্যের অহিংসাবোধও ভালো—
জীবনের ভালো এবং ভালোবাসা আমি জানলাম
প্রস্রাব করার চেয়ে কঠিন কিছু নয়— মানুষ বলে
এসেছি মানুষের দলে এনেছি কনট্রাসেভটিভস্ ও আত্মা—
উপদংশ রোগের চেয়ে কবিতার কামড় বড় বেশি বুঝেছি
পৃথিবীতে আজ সহজেই ক্ষয়রোগের জীবাণু মেলে এবং
সহজ প্রসবের ব্যবস্থা মেলে—
একা একা ছুটতে ছুটতে চলে এলাম
উৎসবের উঠোন থেকে খুলে পড়ল ফুল—
আমার ভয়
নিজের হাতের শিরা নিজে কেটে ভয় পেয়েছি
মাথার উপর লম্বমান অলৌকিক চাপ
পায়ের তল থেকে শিকড় চলে গেছে ভূগর্ভে
মায়ের গর্ভের কথা আজ মনে হয়— দশদিকের
গর্জন ছুটে আসছে— দশটি সাপের দশটি পুণ্যের
বিনিময়ে সহজ অন্তঃকরণে নিয়ে চলে যাব— আমি প্রস্তুত